সরকারের অদ্ভুত আইন

কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি

একটি অদ্ভুত আইন করে বিগত সরকার। ১১ জুলাই ২০০০ সালে 'জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ২০০০' আইনটি গেজেটে প্রকাশিত হয়। আইনটি কার্যকর করার ঘোষণা দেয়া হয় ১৫ জুলাই, ২০০১-এ। এই দিনটি ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের দিন। অন্যভাবে বলা যায়, আওয়ামী সরকারের শেষ কার্য দিবস। এমন দিনে এরকম আইন তড়িঘড়ি করাতে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কী এমন আছে এই আইনে? সরকারের কতটুকু লাভই হলো এ আইন প্রণয়নে? নাকি কোনো বিশেষ মহলের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য করা হয়েছে আইনটি?

এই আইনের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান সেটেলমেন্ট কার্যালয় গৃহ সংস্থান অধিদপ্তরকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ বানানো হয়। ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে আইনটি করা হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। তবে দুর্নীতি সীমিতকরণ এবং কাজের গতি বাড়ানোর জন্য আইনটি করা হয়েছিল বলে একটি সূত্র জানায়। অবশ্য এই আইনের মাধ্যমে এর কোনোটিই সম্ভব হবে না বরং বাড়বে বলেই জানায় সূত্রটি। সূত্রটির মতে, যেখানে সরকারের পক্ষেই এই প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ কঠিন সেখানে একই লোক কাজ করা অবস্থায় শুধু স্বায়ত্তশাসন দিলে কীভাবে কমবে দুর্নীতি। আর কাজের গতি বাড়ানোও সম্ভব নয়। কেননা প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কাজের জন্য সরকারের সাহায্যের ওপরই নির্ভর করতে হয়। যেমন কোনো জমিকে অবৈধ দখলমুক্ত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাহায্যের প্রয়োজন। কাজেই এই স্বায়ত্তশাসন শুধু কাগজে-কলমে তাও আবার অবৈধ। এখন পর্যন্ত জাতীর গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম সম্পন্ন হয়নি। শুধু তাড়াহুড়ো করে প্রথম দিনে (১৬ জুলাই, ২০০১) চেয়ারম্যান (একজন) ও চারজন সদস্যকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিয়োগ দিয়েছে। এখন আইনটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির এমন অবস্থা যে প্রতিষ্ঠানটি না সরকারি, না স্বায়ত্তশাসিত। সেই সময়ের পূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন আর পূর্ত সচিব কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীর কারণেই এমন আইন অবৈধভাবে কার্যকর করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আইনটি করেই তারা ক্ষান্ত হননি। সেই সঙ্গে তারা সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব বাংলাদেশ ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের বদলে বেসরকারি ব্যাংক 'বেসিক ব্যাংক'-এ একাউন্ট খুলে সরকারি রাজস্ব জমা করতে বাধ্য

করেছেন। অথচ এখনো প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি দেয়া হয় সরকারি কোষাগার থেকে। আর বেসরকারি ব্যাংকে জমা হওয়া টাকা দিয়ে গাড়ি কেনা, বাগান পরিচর্যা, বিল্ডিং মেরামত, কম্পিউটার কেনার নামে দুর্নীতির পরিমাণ বাড়তে পারে।

গত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে রাজস্ব আয় হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি টাকা। এখনও প্রতিষ্ঠানটির অধীনে ঢাকার মিরপুর ও মোহাম্মদপুরে কিছু অবরাদ্দকৃত জমি রয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে কয়েকশ' বিঘা জমি। এগুলো বিক্রি করলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়তে পারে মুহূর্তের মধ্যেই। অথচ আইনটি অবৈধভাবে কার্যকর করায় এখন কোটি কোটি টাকা সরকারের নামে সরাসরি জমা হবে না। জমা হবে বেসিক ব্যাংকে। ক্ষতি হবে সরকারেরই। সরকার নিজে এমন অদ্ভুত আইন করে নিজেরই ক্ষতি করছে।

আইনটি অদ্ভুত এ জন্য যে, এরকম আইন কার্যকর করার আগে অবশ্যই মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিতে হবে। সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়াও এই আইন করা কোনোভাবেই বৈধ হয় না। রুলস অব বিজনেসের ১২(১) ও ১২ (৩) নং বিধি অনুযায়ী নতুন পদ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে। কার্যপ্রণালী বিধির ধারা ১২ এবং শিডিউল V-এর ২১ ক্রমিক অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারিকৃত ১৫/১০/৯২ইং তারিখে ৫১.১১০.২০.১৯২-৩২০(৫০০) সংখ্যক আদেশ মানা হয়নি এবং এক্ষেত্রে ৯/১১/৯৬ তারিখের ৭১৬১/ কমন/ বাস্তবায়ন-৩ স্মারকের পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি। এখানে কার্যপ্রণালী বিধির ১২ ধারার ব্যতয় ঘটানো হয়েছে এবং ৫২৯টি পদবিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামোর যে অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয় প্রদান করে তার সংশ্লিষ্ট নোটের ২৪ (গ) অনুচ্ছেদ আইনটিতে প্রতিপালিত হয়নি। অবশ্য ১৫ জুলাই, ২০০১ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের যে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) ঘোষিত হয়েছে সে বিষয়ে ঐ তারিখেই সংস্থাপন মন্ত্রণালয় তার আপত্তির কথা অর্থ মন্ত্রণালয় ও গৃহায়ন মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়ও দুইবার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১৭ অক্টোবর দুই দিনে আলোচনায় বসেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয়, অর্থ এবং পূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব এ এম এম জব্বারের সভাপতিত্বে এই বৈঠকেও আলোচিত হয় এমন একটি আইন সরকার প্রধানের অনুমোদন ছাড়া কার্যকর করা হলো কীভাবে। কিন্তু যারা অবৈধভাবে আইনটি কার্যকর করল, যাদের কারণে একটি প্রতিষ্ঠান স্থবির হয়ে পড়ছে, সরকারের কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

তারপরও এমন আইন কার্যকর হবার পর যদি সাধারণ মানুষের হয়রানি কমতো। কার্যত ঘটেছে এর উল্টো। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হবার আগে হাউজিং এস্টেটগুলোর কাজ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সম্পন্ন হতো। বর্তমান অবকাঠামোতে কুমিল্লা আর চাঁদপুরের লোকজনকে যেতে হবে সিলেট নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদেরকে আবার সিলেট থেকে চট্টগ্রামেও যেতে হবে। এইভাবে মাইজদীর জনসাধারণকে চট্টগ্রাম এবং পটুয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোর হাউজিং এস্টেটের লোকজনকে প্রথমে খুলনায় পরে রাজশাহী যেতে হবে। নতুন আইনে মানুষকে শুধু দুর্ভোগই পোহাতে হবে। আসলে আইনটি কার্যকর করে সরকার-জনগণ কারোরই কোনো লাভ হয়নি বরং ক্ষতিই হয়েছে। তাহলে কেন এমন আইন তাড়াহুড়ো করে অবৈধভাবে কার্যকর করা হলো?